সময় পাকিস্তান আমল।

ডিস্ট্রিক্ট দিনাজপুর। শান্ত শহরের মাঝখানে বালুবাড়ি পাড়া। এখানে বনেদি আর রুচিশীল পরিবারগুলোর বাস। বাসার সামনে ল' কলেজ আর সরকারি হাসপাতাল আছে। পাশে হাজী দানেশের বাড়ি। শহরের স্বনামধন্য কাদের উকিলের বিশাল বাড়িতে কায়সার আলী তার স্ত্রী ও তিন সন্তানকে নিয়ে তিন রুমের একটা বাসা ভাড়া নিয়েছে। সাধারণ মানের বাসা। বাসার সামনে মসজিদ আর বিশাল এক কাঁঠালগাছ। কায়সার আলীর এক মেয়ে দুই ছেলে। বড় মেয়ে পদ্ম, ছেলে বাদল আর আলম। সকলে দেখতে সুশ্রী। কায়সার আলী সাধ্যের চেয়ে সংসারের প্রতি বেশি মনোযোগী। সে রেলওয়েতে চাকরির সুবাদে কোয়ার্টার্সের বরাদ্দ পেলেও ভাড়া বাসাতে থাকা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। ছেলেমেয়েরা মুক্ত মনে সাধারণ পরিবেশে বেড়ে উঠবে, সংকীর্ণতায় নয়।

স্ত্রী হালিমা খাতুনের গায়ের রং শ্যামলা। তার মুখের নাক-নকশা তেমন তীক্ষ্ণ নয়। কিন্তু সে মায়াবতী এবং বুদ্ধিমতী নারী। কপালে বড় লাল টিপ পরে। সরিষার তেলে বানানো কাজলে চোখের কিনার পর্যন্ত লম্বা টান দেয়। হালিমা খাতুন তিরিশ টাকা দামের শাড়ি ঘরে পরে। কাঞ্চিভরণ আর সূক্ষ্ম বুননের মসলিন শাড়ি পরে পার্টি বা লেডিস ক্লাবে যায়। ক্লাবে নারী সদস্যদের মধ্যে এমব্রয়ডারি সেলাই করার প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতায় সে বরাবর প্রথম হয়। স্বামী গরবে গরবিনী ব্যক্তিত্বময়ী হালিমা খাতুন সবার কাছে আদরনীয়, সমান পছন্দনীয়।

ছয় ফুট দুই ইঞ্চি উচ্চতার কায়সার আলী পোশাক-পরিচ্ছদে দারুণ পরিপাটি। সে কুচবিহার কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশনের পর রেলওয়েতে চাকরি পেয়েছে। ছাব্বিশ বছর বয়সে এগারো বছরের বালিকা হালিমা খাতুনকে বিয়েও করেছে। বিয়ের ঘটনাটা বেশ নাটকীয়।

হালিমার মা যখন মারা যায়, সে তখন হামাগুড়ি দিয়ে তার মৃত মায়ের দুধ খাচ্ছিল। এ বিষয়টা হালিমার চাচিরা দেরিতে বুঝতে পেরেছিলেন। বোঝার পর হালিমাকে তার মার বুক থেকে টেনেটুনে আলাদা করে নিয়েছিলেন। কী হৃদয়বিদারক ঘটনা!

পরের সময়গুলোতে হালিমা তার পেশায় ডাক্তার বাবার বুকে মুখ রেখে, চুষে কিছুটা বড় হলো। হালিমার বাবাকে গ্রামের সবাই হোসেন ডাক্তার নামে চেনে। হালিমার বাবার বংশ চৌধুরী। হোসেন ডাক্তারের বুক পুরুষদের চেয়ে একটু বেশি বড় দেখাত। কারণ হালিমা তার বাবার বুককে মায়ের স্তন মনে করে দুগ্ধ পান করেছিল। বৃথা চেষ্টা হলেও হালিমার